প্রথম অধ্যায়

অমিয়ভূষণ মজুমদারের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য

অমিয়ভূষণ মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৮ সালের ২২শে মার্চ কোচবিহার শহরে মামার বাড়িতে। পিতা অনন্তভূষণ মজুমদার, মাতা জ্যোতিরিন্দু দেবী। অমিয়ভূষণের পিতা ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। অনন্তভূষণ ও জ্যোতিরিন্দু দেবীর নয় জন সন্তান কনকেন্দু, মাধুরী, গোপালভূষণ, অমিয়ভূষণ, অসীমভূষণ, অরুণভূষণ, অশনিভূষণ, অজিতভূষণ এবং শেফালীভূষণ (অল্পবয়সে মারা যান)। পিতামাতার চতুর্থ সন্তান অমিয়ভূষণ। পৈতৃক নিবাস অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার পদ্মা তীরবর্তী পাকুড়িয়া গ্রামে। পাকশি রেলস্টেশন সংলগ্ন হার্ডিঞ্জ ব্রিজ থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত এই গ্রাম। পাল্কী অথবা গোরুগাড়িই ছিল সে সময়ের চলাচলের একমাত্র উপায়। পাকুড়িয়ার এই বাড়িতেই অমিয়ভূষণের শৈশবের বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়। তারপর মামা বাড়িতে চলে যান পড়াশুনার জন্য। অমিয়ভূষণের প্রপিতামহ মথুরাপ্রসাদ নীলকর সাহেবদের কাছ থেকে পাকুড়িয়ার এই বাড়িটি ক্রয় করে মজুমদার বংশের পত্তন করেন। প্রাচীনগন্ধী এই বাড়ির আভিজাত্যময় বাতাবরণ শিশু অমিয়ভূষণকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। শৈশবের কথা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—

> ‘‘আমার শৈশবের চোখে নীলকুঠির সেই দুর্গাকার বিস্তৃতি ও গড়ন, আধ-ইঞ্চি-পুরু লোহার পাতের দশ-এগারো ফুট দরজাগুলো এক-বুক উঁচু বাঁধানো নীল চৌবাচ্চার দেওয়ালগুলো যার উপরে আরো ফুট-পাঁচেক গেঁথে তুললেই অনায়াসে হলঘর, শোবারঘর ইত্যাদি করা যায়, আর তা না-করলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের খুঁড়ে বার করা পরিচ্ছন্ন ধ্বংসাবশেষের সাজানো-গোছানো এক্‌জিবিট, যার ফলে দুর্গর কল্পনাটাই বাড়ে; পুরনো দু’একটা তরোয়াল, ঢাল, ঢোলকাকার, ঢাকাকার, প্রকাণ্ড করবীফুলের আকার কাচের চিমনিগুলো, দু-তিন কেজি তেল ধরে এমন প্রকাণ্ড হিংকসের হারিকেন লণ্ঠন— এসবই অবাক হওয়ার মতো বোধ হতো।’’[১]

একদিকে পাকুড়িয়ার এই আভিজাত্যময় গ্রামীণ ভাবধারা অপরদিকে মামার বাড়ি কোচবিহারের শহরজীবনের আধুনিক ভাবধারা এই দুই মিলে অমিয়ভূষণের শৈশবের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। আট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে বছরে দু তিনবার কখনো কোচবিহারে কখনো পাকুড়িয়ায় থাকতে

হয়েছে। কোচবিহারে মামা-বাড়িতে তেমন আভিজাত্য ছিলো না, কিন্তু বেশ আধুনিক ছিল। ছোটখাটো বাড়িটিতে বাগান, পুকুর এসব কিছু ছিলো না। বাড়ির সামনেই ছিল বাঁধানো সুরকির রাস্তা, যার উপর দিয়ে ঘোড়াগাড়ি ও মোটরগাড়ি চলতো। কখনো কখনো প্রকাণ্ড সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে মানুষ ও হাতি চলতো সেই রাস্তায়, যা দেখে তার শিশু মনে কৌতূহল জাগতো। শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলিতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা প্রখর অনুভূতিপ্রবণ অমিয়ভূষণের মনে দাগ কাটতে থাকে। ১৯২৬ সালের দুটি ঘটনা অমিয়ভূষণের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল, যেগুলি তিনি পরবর্তীকালে 'নিজের কথা'র বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর এক ভায়ের চিকিৎসার জন্য পাকুড়িয়া থেকে পদ্মা বেয়ে স্টিমারে পাবনায় যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে গোটা রাত আতঙ্কের আবহাওয়ায় কাটিয়ে অবশেষে ভোররাতে পাবনায় পৌঁছেছিলেন। ভীত, ত্রস্ত যাত্রীদল আতঙ্কে ছুটোছুটি করে স্টিমারের ভারসাম্য টলিয়ে দিচ্ছিল। তাদের স্থির রাখার জন্য বাধ্য হয়ে মৃদু লাঠি চালনাও করতে হয়েছিল। সেই ঝড়ের পদ্মায় চারটি শিশু ও তাদের মা সহ অমিয়ভূষণের পিতা কোনো রকমে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু অমিয়ভূষণের একটি প্রত্যয় সেই সময় থেকে জন্ম নিয়েছে— ''পুরুষের ঈশ্বর নির্দিষ্ট একটাই যুক্তি অস্তিত্বের সন্তানদের রক্ষা করা।''[২] এই প্রত্যয়টা সেই রাত থেকে তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল। পদ্মার ভয়ঙ্করী রূপ এবং পদ্মা ও পদ্মা তীরবর্তী গ্রামজনপদের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দুই-ই প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয় পদ্মা তীরবর্তী পাকুরিয়া গ্রামে শৈশব এবং রাজশাহীতে প্রথম চাকরি জীবনের দিনগুলি পদ্মা তীরবর্তী অঞ্চলে অতিবাহিত হওয়ায় পদ্মা তাঁর জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে যায়। তার রচিত উপন্যাসেও দেখি পদ্মা বিভিন্ন ভাবে স্বমহিমায় চিত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় আর একটি ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর জীবনের মোর ঘুড়িয়ে দিয়েছিল। ইংরেজদের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে তৈরি হয়েছিল ইংরেজি ভাষার প্রতি অদম্য আকর্ষণ। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কৈশর থেকে তাঁর এই দুর্বলতার কারণ নির্দেশ করেছেন একটি ঘটনাসূত্রে— তাঁর কঠিন অসুখ বা ব্যাধি যার সূচনা হয়েছিল পাবনা শহরের সেই সাময়িক প্রবাসে যার জন্য তাঁকে মাস তিন-চার কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনে পাইকপাড়া ওয়ার্ডে ভর্তি হতে হয়েছিল। যেখানে কর্নেল নেপিয়ার ছিলেন কর্তা। সেখানে তখনই ভর্তি না-হতে পারলে বাঁচার আশা ছিলো না। অথচ কর্নেল নেপিয়ার একবার চোখ টেনে দেখে, বার দুয়েক পেট টিপে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। চেম্বারে গিয়ে তাঁকে ভিজিট দিতে হয়নি। এমনকী তাঁর কোনো অ্যাসিস্ট্যান্টকে ধরেও তাঁর কাছে পৌঁছাতে হয়নি। সেই সময়ের একটি রাতের কষ্টের

কথা তিনি আজও ভুলতে পারেন নি। সে রাতে আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকার সময়ে তিনি অনুমান করছিলেন নার্সরা আসা-যাওয়া করছে। সে হলে তখন মাঝেমধ্যেই মৃত্যু ঘটছিল। এ বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি—

> ''সে রাতে কি আমারও মৃত্যু হবে? মৃত্যু কী? না-থাকা বুঝতে পারছি। স্ক্রিন দিয়ে বেডকাটে ঘিরে দেয়, পরে আর সেই রুগীকে দেখা যায় না। চোখে জল ছিলো বোধহয়; নিঃশব্দ কান্নার, উদাস ব্যথার, ভয়ের।''[৩]

সে সময়ে সারারাতে এক মেম-নার্সকে তাঁর বিছানার পাশে থাকতে দেখেছিলেন। যদিও তার আটটায় ডিউটি শেষ হওয়ার কথা। ধবধবে রং, হাসলে মুখ লাল হয়, নাকের ডগাটা একটু উল্টানো নীলে-সবুজে মিশানো চোখ। যাই হোক বালক অমিয়ভূষণ তখন থেকে এই নার্স ও কর্নেল নেপিয়ারের কাছে কৃতজ্ঞ থেকে গেছেন। তারই ফলস্বরূপ তাঁর ইংরেজি সাহিত্য ও ভাষার প্রতি ভালোবাসা জন্মে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের জীবনে এই ধরনের আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, যেমন কিশোর অমিয়ভূষণের মনে আট বছর বয়সের একটি ঘটনা দগ্‌দগে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পে এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে। তখনকার সেই ভয়ানক জাতি বিদ্বেষের আঁচ লেগেছিল কিশোর অমিয়ভূষণের মনেও—

> ''ঢাকাতে দাঙ্গা হচ্ছিলো। আমাদের গ্রামে সেই দাঙ্গা এসে পড়তে পারে এরকম সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিলো। বড়দের ক্রোধ ও আশঙ্কার আলাপ শুনছিলাম। রামদা, তরোয়াল, সড়কিতে ধার পড়ছিলো। বাবা বন্দুক কিনে আনলেন, কয়েক বাকসো পিতলমোড়া বুলেট। অনেকদিন রাতে বাবা বন্দুক হাতে গ্রাম ঘুরতে বেরোতেন। শুনতাম ওরা হিন্দুদের কেটে ফেলে, হিন্দু মেয়েদের চুরি করে। মার মুখ শুকনো, বাবার মুখ গম্ভীর।''[৪]

পাকুড়িয়া থাকাকালীন এসব নানা ঘটনা তাঁর কিশোর মনে নানা পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু এসব কিছুর পরেও কিশোর অমিয়ভূষণের মনকে আগলে রাখতো মায়ের কোমল স্নেহ। এরপর যখন ১৯২৭ সালে ৯ বছর বয়সে কোচবিহার শহরে পড়াশুনার জন্য পাকাপাকি ভাবে মামার বাড়ি চলে আসেন তখন জীবনে বড়সড় পরিবর্তন আসে। দাদামশায় রামনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন কোচবিহারে প্রথিতযশা আইনজীবী। মামা রমেশনারায়ণ চৌধুরীও কোচবিহারে আইন ব্যবসা করতেন। ওই বছরে অমিয়ভূষণ স্কুলে ভর্তি হন। মামা রমেশনারায়ণ চৌধুরী অমিয়ভূষণকে গ্রাম থেকে এনে কোচবিহারের জেন্‌কিনস্ স্কুলে সেভেন্থ ক্লাসে (ক্লাস ফোর) ভর্তি করে দেন। জেন্‌কিনস্ স্কুল

ছিল সে সময়ের মডেল স্কুল। স্কুলের পড়াশুনা এবং মামা বাড়ির সান্নিধ্যে পাওয়া আধুনিক পরিবেশে যেন তাঁর নতুন জীবনের সূচনা হ'ল। সে সময় বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত কিছু বিচার করার ক্ষমতা তৈরি না হলেও সে সময়ে পাওয়া অমলিন সুখের স্মৃতিটুকু তিনি সারাজীবন মনে রেখেছিলেন, তা পাই 'নিজের কথা'য় তাঁর বর্ণনায় এই সুখের বা সমৃদ্ধির ছবিটি নিম্নরূপ—

> ''রাজবাড়ির মারফত ১৯২৭-এই, ১৯২৭-এর, লন্ডনের হালচালের গল্প ছড়িয়ে পড়া, দিদিমার বই পড়া, বই লেখা, সভা-সমিতি করা, ব্রাহ্মমন্দিরে যাওয়া, তাবিজ-কবজ মানত-না-মানা ঈশ্বর আছেন কিংবা নেই, থাকলে তাঁর চেহারা আছে কিনা-এসব আলাপ, মামার সঙ্গে বসে সেই ১৯২৭-এই রবীন্দ্রনাথের গান শেখা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে অতুলপ্রসাদ, ডি এল রায়ের গানও, আর স্কুল, কলেজ বেলা দশটায় ছাত্রছাত্রীতে পথঘাট ভরে যাওয়া, আর ক্রিকেট, টেনিস। আর, এইসব আধুনিকতার সঙ্গে যা চোখে লেগেছিলো তা সৌন্দর্য-রূপ।''[৫]

এই স্কুলে পড়াশুনার সময় তিনি অনেক গুণী শিক্ষককে পেয়েছিলেন এবং তাদের অনেকে—

> ''আমার অনুভূতিতে জীবিত। তাঁদের সম্বন্ধে এখনো আমার কৃতজ্ঞতা মেশানো ভালোবাসার ভাব মনে আছে। তাঁদের যে মুখ আমরা দেখেছি তা আদর্শবাদীর।''[৬]

এই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কিশোর অমিয়ভূষণের সাহিত্যপ্রীতির সূচনা। এই স্কুলের মাস্টারমশায় ঊষাকুমার দাস মহাশয়ের সৌজন্যে অমিয়ভূষণের মনে প্রথম সাহিত্যানুরাগ জন্মে। তিনি ক্লাস সিক্সে অঙ্কের ক্লাস নিতেন। অঙ্কের শিক্ষক হয়েও তাঁর সাহিত্যের ক্লাসে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত। পাঠ্যপুস্তক 'মণিমালা' পাঠের পর অমিয়ভূষণ মনে মনে তাঁকে গুরু বলে মেনে নেন। বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীতে সে কথা স্মরণ করেন অমিয়ভূষণ—

> ''কিন্তু অবাক হলাম। কী সুন্দর কণ্ঠ! কী মধুর কবিতা পাঠ! ঊষাকুমার দাস মশায়কে আমার মন অঙ্ক থেকে সাহিত্যে প্রমোশন দিতে রাজি হলো। এটাকেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বলব। অঙ্কে যিনি আমাকে পাঁচ দিয়েছিলেন। তিনি আমার উপকার করেছিলেন কিনা তা আগেই বলেছি। তিনি মাস্টারমশায় ছিলেন, গুরু নন। 'মণিমালা' হাতে ঊষাবাবু আমার গুরু হলেন।''[৭]

এছাড়াও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে থাকা ল্যাম ও শেক্সপীয়র-এর প্রেমের কবিতা ও নাটক পাঠ করার ফলে অমিয়ভূষণ ইংরেজি সাহিত্যকে আরও ভালোবেসে ফেলেন। কোচবিহারে মামা বাড়িতে

আসার বছর দুয়েক পরে অমিয়ভূষণের পিতা সপরিবারে পাকুড়িয়া ছেড়ে কোচবিহারে চলে আসেন। কোচবিহার শহরে এসে চল্লিশ বছর বয়সে চাকরিতে যোগদান করেন। শুধুমাত্র তাঁর পড়াশুনা এবং তাঁকে অবলম্বন করে গোটা পরিবারের কোচবিহারে চলে আসা তাঁর কাছে আদর্শবাদের ফল বলে মনে হয়েছিল। অনাধুনিক, জমিসংশ্লিষ্ট গ্রাম থেকে, বিদ্যাবিমুখ সামন্ততান্ত্রিক কালচার থেকে, আধুনিক বিদ্যামুখী সংস্কৃতিতে সংযুক্ত হওয়ার আদর্শবাদ। আবার অন্য আর একটি কারণও ছিল, কেননা সে সময় তাদের দুর্গাকার কুঠিবাড়ি নিয়ে শরিকি বিবাদ ও পিতার আর্থিক টানাপোড়েন চরমে পৌঁছেছিল, সর্বোপরি ছিল আপনজনের সান্নিধ্যে ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য মায়ের ঐকান্তিক বাসনা। যাই হোক পিতার তত্ত্বাবধানেই শুরু হয় কোচবিহারের প্রথম জীবনের পড়াশুনা। ১৯৩৪ সালে জেন্‌কিনস্‌ স্কুল থেকে Frist division নিয়ে ম্যাট্রিক পাস কলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে আই.এ পাস করেন। তারপর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। ভর্তি হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পরায় পুনরায় কোচবিহার কলেজে এসে ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হন। কলেজে ইংরেজি অনার্স পড়ার সময়েই ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা জন্ম নেয়। সিলেবাসের বাইরেও লাইব্রেরী-রুমে বসে ইংরেজি সাহিত্যের বই নিয়ে পড়াশুনা করতেন। বি.এ পড়া শেষ করে সাজাদপুরে রাজার কাছারিতে বসানো পোষ্টঅফিসে কেরানি পদে যোগদান করেন। পিতার ইচ্ছা ছিল ছেলে বড় কোনো চাকরি করবে। কিন্তু সে সময় ফজলুল ও আজিজুল হকের সময় ফলে হিন্দুদের চাকরি পাওয়া যথেষ্ট দুঃসাধ্য। তুলনায় ডাকঘরের চাকরিতে ঢোকা হিন্দুদের পক্ষে অনেকটা সহজ ছিল। তাই ডাকঘরের চাকরি গ্রহণ না করে উপায় ছিল না এবং এজন্য তাঁর প্রথমদিকে হীনমন্যতা ছিল। চাকরিতে যোগদান করতে যাওয়ার দিনে রাজশাহী জেলার সেই গ্রামে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন মামা। অ্যাডভোকেট হিসেবে সে সময় মামার বেতন ছিল কেরানির বেতনের চেয়ে প্রায় চল্লিশগুণ বেশি। কিন্তু সেই মামার একটা আদর্শ ছিল। কম বেতনের চাকরি হলেই মানুষ হিসেবে কম দামী হবে এমনটা তিনি কখনো মনে করতেন না। চাকরিতে যোগদানের সময় থেকে মামা এই আদর্শবোধ তাঁর মনে সারাজীবনভর ক্রিয়াশীল ছিল। চাকরি জীবনে প্রবেশ করার অল্পদিনের মধ্যেই বাইশ বছর বয়সী অমিয়ভূষণের সঙ্গে ষোল বছর বয়সী গৌরী দেবীর বিবাহ হয়। গৌরী দেবীর পিতা রাধিকারঞ্জন কলকাতার ঢাকুরিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। এই গৌরী দেবী'ই ছিল লেখকের আজীবনের সঙ্গী এবং সকল কর্মের অনুপ্রেরণা। ডাকঘরে চাকরি পাওয়ার পর থেকে তিনি অবসর সময়ে বই

নিয়ে বসা অভ্যাস করেন। ইংরেজি অনার্স নিয়ে কলেজে পড়ার সময় তাঁর বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না—

> ''কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথকে তত চিনতাম না। রবীন্দ্রনাথের গান জানা ছিলো, পাঠ্য হিসেবে গল্পগুচ্ছ, দু-একটা প্রবন্ধ, কিছু কবিতা পড়া ছিলো, কিন্তু আর কিছু পড়া ছিলো না। তাঁর শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কিছু জানতাম না, তাঁর উপন্যাস একটাও পড়িনি। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ছাড়া তাদেরও চিনতাম না। আমার কষ্ট হতো শেক্সপীয়ার, ভিক্টোরিয়ান কবিকুল, ভিক্টোয়িান ঔপন্যাসিকদের থেকে সরে এসে, ...''[৮]

ইংরেজি সাহিত্যের প্রতিই ছিল অমিয়ভূষণের প্রবল আকর্ষণ। ডাকঘরে চাকরির সময়েই তিনি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৪৩-৪৪ সালের দিকে অমিয়ভূষণের পিতা কোচবিহার থেকে চলে আসেন পাকুরিয়ায়। কেননা ছেলেদের পড়াশুনা করিয়ে মানুষ করার জন্য কোচবিহারে থাকার আর প্রয়োজন ছিল না। বড় তিন ছেলে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং ছোট দুই ছেলে বি.এ পড়া শেষের দিকে। তাছাড়া তিনি জমিজায়গা সহ গ্রামীণ জীবনই বেশি পছন্দ করতেন। অমিয়ভূষণ জীবনে বাঁচার তাগিদেই চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। তাই এইসময় অমিয়ভূষণ পিতার কাছাকাছি থাকার জন্য সাজাদপুরের রাজার পোস্টঅফিস থেকে বদলি হয়ে পাকসি রেল কলোনির পোস্টঅফিসে চলে আসেন। সেখানে একটি ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। কাজের অবসরে রেলবাবুদের সঙ্গে ওঠা-বসা গালগল্প নিয়ে মজে থাকতেন। পাকসি রেলস্টেশন থেকে পাকুড়িয়া গ্রামের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। অমিয়ভূষণ মাঝে মাঝে ডাকঘরের কাজ সেরে গ্রামের বাড়িতে যেতেন। এছাড়াও অমিয়ভূষণের পিতা কখনো কখনো পাল্কী পাঠিয়ে পুত্র ও পুত্রবধূকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। তখন শৈশবের মতো কল্পনা নয় বাস্তবের দৃষ্টিতে বিচার করতে শিখেছেন। পুরাতন নীলকুঠির সেই বাড়িকে আর স্বপ্নে আঁকা দুর্গ বলে মনে হয় না। স্বল্পবিত্ত জমিদারের আশ্রয়স্থল সেই বাড়িটির ভিত এখন শরিকী বিবাদে জরাজীর্ণ। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও অমিয়ভূষণের মনে শৈশবে দেখা সেই বাড়ির গাম্ভীর্যপূর্ণ আভিজাত্য চির অমলিন ছিল। পরবর্তীকালে 'নীলভুঁইয়া', 'রাজনগর', 'গড় শ্রীখন্ড' প্রভৃতি উপন্যাসে সেই বাড়ির প্রভাব দেখা যায়। বাস্তবের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই সময় অমিয়ভূষণের সামনে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, অভাববোধ প্রকট হতে থাকে। ফলে ডাকঘরে চাকুরির নিঃসঙ্গ অন্ধকারময় জীবনে তৈরি হতে থাকে Inferior

complex যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শুরু করেন লেখালেখি—

> ''নিজের অভাববোধ নেই, চারিদিকের অভাববোধ উত্তাল ঢেউ হয়ে গ্রাস করতে চায়। এই রকম অবস্থায় ইতিপূর্বেই কাগজকলম নিয়ে সন্ধ্যার দিকে বসা অভ্যাস হচ্ছিলো। লেখা আত্মস্থ হওয়ার স্বাদ দেয়, একটা ভরশূন্য অবস্থায় অন্য রকমের আলোয় চোখ মেলা যায়, আমার কোচবিহারের আমিত্বে থাকা যায়।''[৯]

লেখালেখির পাশাপাশি এই সময় থেকেই তিনি ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করেন। তাঁর জীবনের অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে এই ট্রেড ইউনিয়ন। সেই সময়কার ট্রেড ইউনিয়ন নেতার অনেকেই তাঁর বন্ধু-স্থানীয় ছিলেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে মতের পার্থক্যও ছিল অনেক। ট্রেড ইউনিয়ন করা তার কাছে অন্য আর দশটা বিষয়ের মতো ছিল না, ট্রেড ইউনিয়ন ছিল তার কাছে অধিকার রক্ষার লড়াই। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন—

> ''নেতা সবচাইতে দক্ষ ও কর্তব্যনিষ্ঠ শ্রমিক হবে। কারিগরের যেমন নিজের কাজে গর্ব থাকে শ্রমিকেরও তা থাকবে, কেননা শ্রম তো টাকা উপার্জনের উপায়ই নয়, জীবনও বটে, ট্রেড ইউনিয়ন এমন নয় যে বুড়ি ছুঁয়ে থেকে রাজনীতি করার সুযোগ।''[১০]

ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে এরকম সুস্পষ্ট ধারণার জন্যই তিনি পুরণো সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ক্ষমতাপুষ্ট শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বেড়িয়ে এসে পাঁচ জন সহকর্মীকে নিয়ে নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন পরবর্তীকালে বিভিন্ন জেলায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। ট্রেড ইউনিয়ন করা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> ''আমার ট্রেড ইউনিয়নে ভালোবাসা ছিলো, প্রতিবাদ ছিলো, তেজ ছিলো, ক্রোধ ও বিদ্বেষ ছিলো না।''[১১]

চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে অমিয়ভূষণ একাঙ্ক নাটক লেখা শুরু করেন। তাঁর লেখা প্রথম নাটক 'দা গড অন মাউন্ট সিনাই' ১৯৪৩-৪৪ সাল নাগাদ কলকাতার 'মন্দিরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অমিয়ভূষণের ভাই অরুণভূষণ মজুমদার 'মন্দিরা' পত্রিকার সম্পাদককে দিয়েছিলেন নাটকটি প্রকাশের জন্য। এর কিছুদিন পরে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় অমিয়ভূষণের একটি গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম 'প্রমিলার বিয়ে'। পত্রিকাটি অমিয়ভূষণের ছোট ভাই ট্রেনে পড়ার জন্য কিনেছিলেন। সেই পত্রিকায় কয়েকটা নতুন ধরনের লেখা ছিল। পত্রিকায় দেওয়া ঠিকানা দেখে অমিয়ভূষণ ডাকযোগে গল্পটি পাঠিয়ে দেন। দিন পনেরোর মধ্যে মানিঅর্ডার যোগে এক কপি পূর্বাশা এবং সঙ্গে পনেরো টাকা

পেয়ে যান অমিয়ভূষণ। এত তাড়াতাড়ি তাঁর গল্প ছাপা হবে ভাবতে পারেননি অমিয়ভূষণ। অমিয়ভূষণের স্ত্রী গৌরীদেবী ছিলেন লেখকের সকল লেখার অনুপ্রেরণা। অমিয়ভূষণ অবসর সময়ে লেখালেখি করতেন, লেখা মনমতো না হলে ছিঁড়ে ফেলতেন। গৌরী দেবী সেগুলি উনুনে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করার আগে পড়তেন। তিনি হতাশ হয়ে একবার লেখককে বলেছিলেন— 'লেখো তো বটে, ছাপে না তো কেউ'। 'প্রমিলার বিয়ে' প্রকাশের পর লেখককে তাঁর লেখার প্রকাশ নিয়ে আর ভাবতে হয়নি। এরপর চতুরঙ্গ, গণবার্তা, ক্রান্তি, প্রভৃতি পত্রিকাতেও তাঁর লেখা প্রকাশ হতে থাকে। পূর্বাশা পত্রিকার সূত্রেই কবি বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এছাড়াও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, অনিল চক্রবর্তী, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখের সঙ্গেও আলাপ হয়। ১৯৪৬-এ কলকাতায় একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছিল। অমিয়ভূষণের জীবনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল—

> ''৪৬ খ্রীস্টাব্দের সেই কলকাতার নরমেধ যার ধাক্কা আমাদের গ্রামেও। ৪৬-র শীতে মা এবং পরিবারের স্ত্রী এবং শিশুদের কোচবিহারের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ৪৭-এর মাঝামাঝি 'মার কঠিন অসুখ' মামাকে দিয়ে এই মিথ্যা টেলিগ্রাম করিয়ে বাবাকে দেশ থেকে বার করে পাঠানো হলো কোচবিহারে। ৪৭-এর ২রা-৩রা আগস্ট আমি কোচবিহারে বদলি হয়ে এলাম। আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ। আবার যেন বাবার সেই স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ঝড়ের পদ্মায় সাঁতার। তখন বাবার বয়স ষাটের কাছে। নতুন করে এক ব্যাংকে চাকরি শুরু করলেন। এবার স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে।''[১২]

ছেচল্লিশের এই 'গ্রেট কিলিং' অমিয়ভূষণকে খুবই বেদনাহত করে। পরিবারের সকলের সঙ্গে পাবনার সেই শৈশব স্মৃতি বিজরিত বসতবাটি চিরজীবনের মতো তাঁকেও ছেড়ে আসতে হয়। শিকড় ছেঁড়ার মনোবেদনা নিয়ে অমিয়ভূষণ পাকাপাকিভাবে কোচবিহারে বসবাস করতে শুরু করেন। বলা যায় এই সময় থেকে তাঁর সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। বাংলা ভাষাতেই তাঁর সাহিত্য সাধনা ও সিদ্ধি। যদিও সমকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রতি অমিয়ভূষণ ছিলেন খানিকটা উন্নাসিক মনোভাবাপন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র-প্রমুখ লেখকদের উপন্যাস পড়েছেন চল্লিশ বছর বয়সে। বিখ্যাত উপন্যাস 'গড় শ্রীখণ্ড' ও 'নয়নতারা' প্রকাশের আগে পর্যন্ত তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র পুরোপুরি অজানা ছিল। কেননা ছোটোবেলা থেকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি

ছিল তাঁর অদম্য আকর্ষণ। ফলে যৌবনকালে ছাত্রাবস্থায় পাঠ্য ইংরেজি সাহিত্য ছাড়া কিছু পড়েন নি—

> ''আসল কথা কলেজের দিনেই তো মানুষ উপন্যাসাদি বেশি পড়ে। আমার সে-বয়সে উপন্যাস লুকিয়ে পড়তে হয়। উপন্যাস পড়ার জন্য বিদ্রোহ করাকে দরকার মনে করিনি আর লুকিয়ে কাজ করতে সে সময়ে অপমান বোধ হতো। ফলে পাঠ্য-সাহিত্য ছাড়া, যা সবই ইংরেজি, সেই যৌবনকালে কিছুই পড়েনি।''[১৩]

কোচবিহার তখন ছিল আধুনিক সংস্কৃতির কেন্দ্র। মানুষের মননে তখন পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক পট-পরিবর্তনের এই অস্থির পরিস্থিতির প্রত্যক্ষদর্শী অমিয়ভূষণ। জাতিদাঙ্গা ও দেশভাগ তাঁর মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে লেখক হিসেবে তিনি তাঁর লেখায় কখনো কখনো জাতিদ.াঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। ১৩৬০ সালে অমিয়ভূষণের 'গড়শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটি কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। 'গড়শ্রীখণ্ড'র পূর্বে তাঁর 'নয়নতারা' নামে 'নীলভুঁইয়া' উপন্যাসটি চতুরঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয় পরিচয়, পূর্বপত্র, উত্তরায়ণ, এষা, বারোমাস, কৌরব, সপ্তাহ, লালনক্ষত্র, গণ বার্তা এবং আজকাল প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল— 'নীলভুঁইয়া' (১৯৫৫) এটি পরবর্তীকালে 'নয়নতারা' নামে প্রকাশিত হয়। 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭), ' নির্বাস' (১৯৫৯), 'দুখিয়ার কুঠি' (১৯৫৯), 'ডম আন্টনিও' (১৯৭২), 'নিউ ক্যালকাটা' (১৯৭৩), 'মহিষ কুড়ার উপকথা' (১৯৮১), 'বিলাস বিনয় বন্দনা' (১৯৮২), 'রাজনগর' (১৯৮৪), 'বিনদনি' (১৯৮৫), 'হলং মানসাই উপকথা' (১৯৮৬), 'সোঁদাল' (১৯৮৭), 'কুমার টপাদার' (১৯৮৭), 'মধু সাধুখাঁ' (১৯৮৮), 'ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড' (১৯৮৮), 'বিবিক্তা' (১৯৮৯), 'মাকচক হরিণ' (১৯৯১), 'চাঁদবেনে' (১৯৯৩), 'বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী' (১৯৯৭), 'রামি রজকিনী' (২০০০), 'মতিঘোষ পার্ক ভানুগুপ্ত লেন', 'ট্রাজিডির সন্ধানে', 'ভুলিনাই', 'অতিবিরল প্রজাতি', 'কালকা মেল', 'এক উপন্যাসের সন্ধানে', 'তাসিলার মেয়র' প্রভৃতি। এছাড়াও রয়েছে প্রায় শতাধিক ছোটগল্প। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলি হল— 'প্রমীলার বিয়ে', 'তাঁতী বউ', 'সান্যালদের কাহিনী', 'দীপিতার ঘরে রাত্রি', 'দুলারহিনদের উপকথা', 'অনঘমিত্রা', 'অ্যাভলনের সরাই', 'একটি খামারের গল্প', 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া', 'উরুন্ডী', 'শ্রীলতারদ্বীপ', 'অর্পিতা সেন', 'সাদা মাকড়সা', 'টাইগন-লিটিগন', 'তুলাইপাঞ্জার রোয়া', 'ভাইরাস',

'মাকচক', 'নীল আকাশ সবুজ পাহাড়' ইত্যাদি। তিনি পঞ্চাশটির মতো প্রবন্ধও রচনা করেন তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল— 'সাহিত্যের ধারণা', 'রবীন্দ্রোৎসব', 'শরৎচন্দ্রের উপন্যাস', 'সাহিত্য ও স্বাধীন চিন্তার দায়িত্ব', 'উপন্যাস সম্বন্ধে', 'প্রাচীন কোচবিহারের ভাষা এবং সংস্কৃতি', 'সঞ্জয় ভট্টাচার্য', 'উদ্বেল সেই দয়ার সাগরকে', 'জনৈক ইমমরালিস্টের চিঠি', 'স্বপ্ন ভঙ্গ', 'রমণী রত্নের সন্ধানে', 'শ্রীকান্তের কী ঘটে', 'দৃশ্যকাব্য', 'ঔপন্যাসিক ও জীবনদর্শন', 'পদ্মপুরাণ কথা', 'গরবাচেভ নীতি ও পৃথিবীর শান্তি', 'শিল্পের আনন্দ', 'সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি', 'উপন্যাসের গল্প', 'সাহিত্যের প্রস্তাব', 'সাহিত্যিক জীবন মহাশয়', 'উপন্যাসের ভাষা' ইত্যাদি। অমিয়ভূষণ কয়েকটি নাটকও লিখেছিলেন, যেমন— 'গড অন দি মাউন্ট সিনাই', 'মহাসত্ত্ব', 'রাঙাদি', 'বিয়োগ', 'মধুরার ফ্ল্যাট ও মিউজিয়াম' ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর রচিত কয়েকটি আত্মজীবনীমূলক রচনা যেমন— 'কেন লিখি নিজের কথা', 'আমার সম্বন্ধে', 'লিটল ম্যাগাজিন ও আমি', 'আমার বাল্যের দুর্গোৎসব' প্রভৃতি। তাঁর প্রতিটি রচনা লেখনীর গুণে হয়ে উঠেছে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। তাঁর রচনায় রয়েছে কাব্যিক কোমলতা ও ভাষা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বলতে পারি তিনি সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তক। সাহিত্যে এই বিশেষ ধরনের অবদানের জন্য তিনি পেয়েছেন ত্রিবৃত্ত পুরস্কার, উত্তরবঙ্গ সংবাদ পুরস্কার, বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, শরৎ চ্যাটার্জী গোল্ড মেডালিস্ট পুরস্কার, কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরস্কার। এতকিছু সত্ত্বেও সাহিত্যিক হিসেবে অমিয়ভূষণ খুব বেশি জনপ্রিয়তা পাননি। কারণ তিনি সকলের জন্য লেখেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন অন্যান্য সাধনার মতোই সাহিত্যচর্চা একটি মহৎ সাধনা। বিনোদনমূলক সাহিত্য রচনার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী অমিয়ভূষণ মনে করতেন— 'পাঠকের সংখ্যা বাড়লেই পাঠ্যের গুণ বাড়ে না।' প্রচারবিমুখ অমিয়ভূষণ কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যকে এবং সাহিত্যিকদের খুব একটা সুনজরে দেখতেন না—

> ''একটা কথা কারও মনে আসে না সমগ্র বাংলাদেশ কলকাতার পাড়া নয়। কলকাতা ছাড়া আর সব যেন পাটের জমি, ধানের জমি, তামাকের জমি। ওখানে বোকা লোকেরা থাকে। আমি এদের ব্রাত্যজন বলি।''[১৪] (সাক্ষাৎকার)

সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কলকাতার আধিপত্যকে তাঁর অসহ্য মনে হতো উত্তবঙ্গে বসবাসের সূত্রে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষজনকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। প্রতিবাদী অমিয়ভূষণ সোচ্চারে জানিয়েছেন—

> '' আসলে আমার বিশ্বাস কলকাতা নামক ঔপনিবেশিক শহর ও কনজুমার গুডসের

আড়তের বাইরেও মেদেনীপুর থেকে বীরভূম, পুরুলিয়া থেকে নদীয়া সীমান্ত, উলবেড়ের উত্তর থেকে সিকিম সীমান্তে ছড়ানো কলকাতার বাইরের যে-ভূমি যাকে তোমরা গ্রামবাংলা বলো (কেন যে বলো? কোন সমাস এটা? কি কুৎসিত শব্দ!) যাকে প্রকৃত পক্ষে হিন্টারল্যান্ড ভাবা হয়, যেখানে দলে দলে কাদায় পা পুতে দাঁড়িয়ে, ভালুক-ভালুক চেহারার কালো-কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরি করে, তথাকথিত শ্রমিকদের ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের যোগান ঠিক রাখে, যে ভূমিতে নীল বিদ্রোহ, চাষী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, যে-ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবস্থান পাতেন সেই ভূমি যা কলকাতার চাইতে অনেক অনেক বড়ো, সেখানে বাঙালিদের দশ ভাগের সাত ভাগ থাকে, সেই আমাদের মাতৃভূমি, তা বকখালি হোক, শুকনা হোক, কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ের গাঁ। কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছি না। কলকাতাকে বলতে চাইছি বেরিয়ে এসো ইংরেজিআনা থেকে-দ্যাখো এই মাতৃভূমি, ভালোবাসো একে মরবে না। কাদায় ডুবে যাচ্ছে, ধোঁয়ায় দম বন্ধ, কতদিন-আর অ্যাংলো-স্যাক্সনি মুখোশে থাকবে!"[১৫]

তাঁর বিভিন্ন রচনায় তুলে ধরেছেন উত্তরের এই প্রকৃতি ও মানুষের স্বাধীন ও অনাড়ম্বর জীবনকে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে পুতুল না করে তিনি রক্ত-মাংসের মানুষ করে তুলেছেন। সাহিত্য সৃজনে অমিয়ভূষণের যুক্তিবোধ ছিল পরিশীলিত এবং ক্রিয়াশীল। তিনি উপন্যাসে অত্যন্ত সচেতনভাবে আধুনিক জীবনের স্ববিরোধ, পুরাণ ও মিথের প্রভাব, মানুষের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি চেতনাকে তুলে ধরেছেন।

উল্লেখপঞ্জি:

১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ : নিজের কথা, অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৯

২. তদেব : পৃ. ৯

৩. তদেব : পৃ. ১০

৪. তদেব : পৃ. ১০

৫. তদেব : পৃ. ১১

৬. তদেব : পৃ. ১১

৭. নাগ, রমাপ্রসাদ : অনন্য অমিয়ভূষণ, কথাপ্রকাশ, বাংলা বাজার, ঢাকা: ১১০০, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৮

৮. তদেব : পৃ. ১৩

৯. তদেব : পৃ. ১৪

১০. তদেব : পৃ. ১৪

১১. তদেব : পৃ. ১৪

১২. তদেব : পৃ. ১৫

১৩. তদেব : পৃ. ১৭

১৪. সাক্ষাৎকার...

১৫. নাগ, রমাপ্রসাদ : অনন্য অমিয়ভূষণ, কথাপ্রকাশ, বাংলা বাজার, ঢাকা: ১১০০, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৮